বাংলাদেশের গণমাধ্যম : বিদ্যমান সংকট ও করণীয়

মো. মামুন অর রশিদ

গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত উঠে আসে সমাজের বহুমুখী সংকটের চিত্র। এসব সংকটের ভিড়ে খোদ গণমাধ্যমের সংকটই আড়ালে পড়েছে। সংকট নিয়েই গণমাধ্যমের যাত্রা শুরু। সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দিনদিন এই সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। সংকটের সুযোগ নিয়ে একটি শ্রেণি গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভখ্যাত এই গণমাধ্যমকে সংকটে রেখে দেশে কখনো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

গত তিন দশকে বেসরকারি খাতের গণমাধ্যমে যে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, তা মূলত অপরিকল্পিত। যাঁরা যেভাবে পেরেছেন, গণমাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন। গণমাধ্যমে বিনিয়োগের উৎস নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। এর ফলে গণমাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছে। অনেকেই নিজেদের ব্যাবসাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য গণমাধ্যমকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আবার, একই গোষ্ঠীর মালিকানায় একাধিক সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন পত্রিকা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে গণমাধ্যমে গোষ্ঠীগত প্রভাব কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এতে গণমাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা কমেছে এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক ভিত্তিও দুর্বল হচ্ছে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে একই মালিকানার অধীন একাধিক গণমাধ্যম বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের আরেকটি সংকট হলো আইনগত সংকট। গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট এমন কিছু আইন আছে, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য প্রতিবন্ধক। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার জন্য প্রযোজ্য এমন কিছু আইনের সংস্কারের জন্য গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে। কমিশন মনে করে, সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও তাতে কিছু অস্পষ্টতা ও অযৌক্তিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ আমল থেকে প্রচলিত কিছু আইন বাক্‌স্বাধীনতা ও মুক্ত সংবাদমাধ্যমের পথে বাধা সৃষ্টি করে আসছে। এর পাশাপাশি বেশকিছু নতুন আইন প্রণীত হয়েছে, যার ফলে স্বাধীন সাংবাদিকতা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের মতে, স্বাধীন সাংবাদিকতার বিকাশে পেনাল কোড (দণ্ডবিধি) ১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-সহ আরও কয়েকটি আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত করেছে।

বাক্‌স্বাধীনতা ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশের চর্চার মতো সুরক্ষিত অধিকারের জন্য সাংবাদিকদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও শারীরিক আক্রমণের শিকার হতে হয়। সাগর-রুনি দম্পতির বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় জনধারণা তৈরি হয়েছে যে সাংবাদিকদের মারলে কিছুই হয় না। বিদ্যমান বাস্তবতা বিবেচনা করে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়নের সুপারিশ করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনে সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশের একটি খসড়াও সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশের সব ধরনের গণমাধ্যমের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য এখনো কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। বিষয়টি বিবেচনা করে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছে। এই কমিশন হবে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। গণমাধ্যম কমিশন সাংবাদিকদের আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রতিপালন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাংবাদিকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ, সারা দেশে কর্মরত সাংবাদিকদের নিবন্ধন ও তালিকা প্রস্তুত করবে। সম্প্রচার ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স দেওয়ার এক্তিয়ারও থাকবে প্রতিষ্ঠানটির হাতে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানোর একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রচারসংখ্যা বাড়ানোর পিছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, বিজ্ঞাপনের জন্য বাড়তি দর আদায়; দ্বিতীয়ত, কম শুল্কে নিউজপ্রিন্ট আমদানি করে খোলাবাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করা। এসব অসংগতি বন্ধে সংবাদপত্রের সঠিক প্রচারসংখ্যা নির্ধারণ করা খুবই জরুরি। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ডিএফপির মিডিয়া তালিকায় থাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৫৯০টি পত্রিকার ঘোষিত প্রচারসংখ্যার যোগফল দৈনিক প্রায় পৌনে দুই কোটি। অথচ হকারদের হিসাবে ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্রি হওয়া পত্রিকার সংখ্যা দৈনিক ১০ লাখের বেশি নয়। এই অসংগতির দ্রুত সমাধানের জন্য প্রচারসংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতিগত সংস্কার করা প্রয়োজন। তবে আশার কথা হলো, সম্প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম সংবাদপত্রের গুণগত মানোন্নয়নে টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। উপদেষ্টার ভাষ্য অনুযায়ী, এই টাস্কফোর্স স্বচ্ছতার সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রকৃত প্রচারসংখ্যা নির্ধারণ, ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন, বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণসহ সংবাদপত্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের সংখ্যাগত আধিক্য অবাক হওয়ার মতো। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট নিবন্ধিত দৈনিক পত্রিকা ১ হাজার ৩৪০টি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ৫৪৬টি এবং ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত হয় ৭৯৪টি। দেশে সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে ১ হাজার ২১৮টি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ৩৫৫টি এবং ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত হয় ৮৬৩টি। এছাড়াও দেশে বেশ কিছু সংখ্যক পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাত্রিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা রয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে,

ইতোমধ্যে অনেক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু কিছু পত্রিকা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আবার কিছু কিছু পত্রিকা শুধু বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ লাভজনক পরিমাণ বিজ্ঞাপন পাওয়া গেলে সেদিন সীমিত সংখ্যায় পত্রিকা ছাপানো হয়। অন্যান্য দিন ছাপানো হয় না। এভাবে সংবাদপত্র চলতে পারে না। সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে একটি শৃঙ্খলিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। আর বাংলাদেশে আদৌ এত ছাপানো পত্রিকার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটাও ভাবতে হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক সচ্ছলতা। বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের গণমাধ্যম কখনোই সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিল না। বিজ্ঞাপনের বাজারে এখন প্রথাগত ও ডিজিটাল মিডিয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা। দেশে ছাপানো পত্রিকার বিক্রি দ্রুত কমছে। সম্প্রচারমাধ্যমও দিনদিন দর্শক-শ্রোতা হারাচ্ছে। অনলাইনে পত্রিকার পাঠক বাড়লেও আয় তেমন বাড়েনি। বর্তমান দেশে কোনো সংবাদমাধ্যমই লাভজনক নয়। গত এক-দুই দশক ধরে নিজের আয়ে চলা এবং প্রসার লাভকরা পত্রিকাগুলোও এখন ব্যয় সংকোচন করছে। বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলেরও একই অবস্থা। এই অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সরকারের নীতিগত সহায়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মালিকানার স্বচ্ছতা। গণমাধ্যমের মালিকানা থেকে সম্পাদকীয় নীতিকে আলাদা করা জরুরি। মালিক শুধু আর্থিক নিশ্চয়তা দেবেন, কিন্তু দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। একইভাবে, প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা মতামতে মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকলে তার স্পষ্ট ঘোষণাও থাকা প্রয়োজন। গণমাধ্যমে বিনিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে গণমাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ হবে এবং অসৎ উদ্যোক্তা নিজেরাই বিদায় নেবেন। এতে গণমাধ্যমে মালিকের হস্তক্ষেপ অনেকাংশে কমবে। গণমাধ্যমকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছে। সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, সংবাদপত্রকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত শিল্প হিসাবে ঘোষণা দেওয়া; ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করা; সংবাদপত্রে বিনিয়োগে কর রেয়াত প্রদান এবং সরকারি বিজ্ঞাপনের হার অন্তত ১০ গুণ বৃদ্ধি।

দেশের গণমাধ্যম আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ায় গণমাধ্যমকর্মীদের বেতন-ভাতা নিয়েও সংকট সৃষ্টি হয়েছে। গণমাধ্যমের সংখ্যাধিক্য ও দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারত্বের পটভূমিতে গণমাধ্যমকর্মীদের বেতন-ভাতা ক্রমেই কমছে। বিদ্যমান বাস্তবতা বিবেচনা করে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন সারা দেশের সাংবাদিকদের স্থায়ী চাকরির শুরুতে একটি অভিন্ন ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। যা হবে সরকারি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার মূল বেতনের সমান এবং প্রতিবছর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে মূল বেতন সমন্বয় হবে। ঢাকার বাইরে কর্মরত সাংবাদিকদের বেতন ও মর্যাদার বৈষম্য দূর করা, সাংবাদিকদের বাড়ি ভাড়া, অবসর ভাতা কিংবা গ্র্যাচুইটি প্রদানের প্রস্তাবও করেছে কমিশন।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে রয়েছে বহুমুখী সমস্যা। স্বল্প সময়ে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। সরকার ও গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্টদের সমন্বিত উদ্যোগে দেশের গণমাধ্যম সংকট কাটিয়ে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ হবে, এমনটাই প্রত্যাশা।

#

লেখক : বিসিএস তথ্য ক্যাডারের সদস্য এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা পদে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত

পিআইডি ফিচার